মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যঃ মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক উপস্থাপন (পঞ্চদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে পি.এইচ.ডি. (আর্টস) উপাধির জন্য প্রদত্ত গবেষণা সন্দর্ভ

গবেষক

শিল্পা মণ্ডল

এনরোলমেন্ট ডেটঃ ১৪/০৭/২০১৪

রেজিস্ট্রেশন নং- **A00HI1200614**

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মেরুনা মুর্মু

অধ্যাপক

ইতিহাস বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা- ৭০০০৩২

২০২১

সারাংশ

গ্রামবাংলার অন্যান্য সকল লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’ সমাজে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে অবস্থিত। এঁরা মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য নায়িকা চরিত্র হিসেবেও সুপরিচিত। প্রধানত ‘ভয়’, ‘ভক্তি’ ও ‘পরিত্রাণে’র পথ হিসেবেই উভয় দেবীর উত্থান ঘটে। দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে বঙ্গদেশে তুর্কি আক্রমণ শুরু হলে বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। ইসলাম ধর্মের আগমন ও শাসককুলের ধর্মীয় ভিত্তি, এবং তাদের ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আগ্রাসী হওয়ার প্রবণতা, মূলতঃ চর্তুদশ শতকের মধ্যবর্তী কাল থেকে বাংলায় প্রচলিত হতে থাকে। বিশেষত, হিন্দু ধর্মের মধ্যে নিপীড়িত নিম্নবর্ণের মানুষেরা বর্ণবৈষম্য থেকে মুক্তিলাভের আশায় ধর্মান্তরিত হয়। অতএব বলা যায়, ইসলামীয় ধর্মান্তরের ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে বর্ণবৈষম্যতাও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। আর এই জটিল পরিস্থিতিতেই হিন্দু ধর্মের ধারক ও বাহকেরা নিজ ধর্মের ঐতিহ্যকে বজায় রাখার তাগিদেই, ধর্মীয় বর্ম স্বরূপ ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে মূলস্রোতে আনার চেষ্টা করেন। এর ফলপ্রসূ, ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়কালে বাংলায় মঙ্গলকাব্যের যুগের সূত্রপাত ঘটে। বর্তমান গবেষণার প্রধান উপজীব্য অনুযায়ী দুই লৌকিক দেবী ‘মনসা’ ও ‘চণ্ডী’কে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া মঙ্গলকাব্যের প্রেক্ষিতে উভয়ের অবস্থান অনুসন্ধান করে, মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক জীবন এর মাধ্যমে কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে।

“মঙ্গলকাব্যের” উত্থানের পিছনে তুর্কি আক্রমণ ও ইসলাম ধর্মান্তরিকরণ প্রক্রিয়ার তত্ত্ব সর্বত্রস্থিত। অর্থাৎ, কাব্যের উত্থানের পিছনে “ধর্মভিত্তিক” ধারণার উৎসকে অস্বীকার করা যায়না। মঙ্গলকাব্য প্রকৃতপক্ষে “ধর্মভিত্তিক” বা “সাম্প্রদায়িক” ধারণাপ্রসূত কিনা, বিদ্বৎকুলের কাছে তা সর্বদাই বিতর্কের বিষয়। আশুতোষ ভট্টাচার্য কাব্যের নেপথ্যে সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাসকে প্রাধান্য

দেননি। তার মন্তব্য অনুযায়ী, "মঙ্গলকাব্য" মূলতঃ বাংলাদেশের লৌকিক ও বহিরাগত বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয়ে সংগঠিত ধর্মবিষয়ক আখ্যানকাব্য। পালরাজাদের সময়কাল থেকে বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধধর্মের সাথে স্থানীয় লৌকিক ধর্ম-সংস্কারের সংমিশ্রণ শুরু হয়। এরফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লৌকিক ধর্মমতের উদ্ভব ঘটে। সেনরাজাদের সময়কালে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধারণের মধ্যে ক্রমে বিস্তৃতি লাভ করলে, বাংলায় দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কারের সংমিশ্রণ ঘটে। মঙ্গলকাব্যগুলি মূলতঃ এর পরিচয় বহন করে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও মঙ্গলকাব্যকে "অসাম্প্রদায়িক" হিসাবে বিবেচনা করেন। সুকুমার সেনও "মঙ্গলকাব্য"কে ধর্মবিশ্বাস বা সংস্কার বর্হিভূত "Secular" কাব্য বলে মনে করেন। তবে, মঙ্গলকাব্যের উত্থানের পিছনে দ্বাদশ শতাব্দীর ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনকে পর্যালোচনা করলে এর স্বরূপ অনুধাবন করা সম্ভব হবে। দেবতার "মাহাত্ম্যকীর্তন" কাব্যের মূল বিষয় হওয়ায়, 'অহিন্দু' ধর্মমতের বিরুদ্ধাচারণই যে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, একথা বলা বাহুল্য। তুলসীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় "মঙ্গলকাব্য"কে প্রতিযোগিতাপূর্ণ "সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক" সাহিত্য হিসাবে অভিহিত করেন। শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্যমূলক সাহিত্য নয়, তিনি এই কাব্যকে বর্ণবৈষম্যমূলক কাব্য হিসাবেও উল্লেখ করেছেন। অনুরূপভাবে, হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য্যও "মঙ্গলকাব্য"কে "হিন্দু ধর্মাশ্রিত" কাব্য হিসাবে মন্তব্য করেন।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে "মঙ্গলকাব্য" এর রচনার পিছনে ধর্মভিত্তিক বিষয়সমূহের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানকে অনুধাবন করা যায়। আশুতোষ ভট্টাচার্যের মনে করেন, "মঙ্গলকাব্য" প্রকৃতপক্ষে লৌকিক শাক্ত ধর্মের অন্তর্গত এক ধরনের "মঙ্গলসূচক" গান। সুকুমার সেনও মঙ্গলকাব্যের কবিতার অংশগুলিকে "ব্রতগীতি" বা "ritual song" হিসাবে উল্লেখ করেন। আবার হংসনারায়ণ ভট্টাচার্যের সরল ব্যাখ্যা অনুযায়ী, মঙ্গলকাব্যগুলি প্রকৃতপক্ষে "আখ্যায়িকা" কাব্য। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্যের একটি অন্যতম অংশ। লৌকিক দেবদেবীর মহিমা প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও, ব্রাহ্মণ্যবাদী ধ্যানধারণায় পরিপুষ্ট এটি এমন একটি "ধর্মভিত্তিক

আবরণ", যার অন্তর্গত হতে পারে মূলতঃ সকল ধর্মের মানুষেরাই। উদাহরণ হিসাবে, মনসামঙ্গল "রাখাল" ও "ধীবর" সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করতে পারি। মনসার পূজা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চাঁদ বণিকের মাধ্যমে সম্পন্ন হলেও, দেবী কিন্তু নিম্নবর্ণের মানুষদেরকে সর্বপ্রথম তার কৃপাদৃষ্টির অন্তর্ভুক্ত করেন। অনুরূপভাবে, ব্যাধ কালকেতুও দেবী চণ্ডীর মহিমায় রাজা হয়ে বসেন। এরপর ধনপতি পুত্র শ্রীমন্তর পূজার্চনার দ্বারা তিনি ত্রিভুবনের দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মনসামঙ্গলের "রাখাল" ও "ধীবর" সম্প্রদায় ছাড়াও ইসলাম ধর্মপ্রচারক "হাসান" ও "হোসেন"ও মনসা পূজার পৃষ্ঠপোষকতা করেন। এর মাধ্যমে অনুমান করা যায়, মনসামঙ্গল কাব্য সকল ধর্মের মানুষের আরাধনাকে সাদরে গ্রহণ করেছে। অনুরূপভাবে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে অহিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা চণ্ডীপূজার দৃষ্টান্ত না থাকলেও, তিনি হিন্দু ধর্মের উভয় বর্ণের দ্বারা উপাসিতা তা প্রজ্বলিত। এক্ষেত্রে গবেষণার মূল প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যগুলির মাধ্যমে মধ্যযুগের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও লিঙ্গভিত্তিক অবস্থানকে কিভাবে অনুধাবন করা সম্ভব?

গবেষণার প্রথম অধ্যায়ে 'মঙ্গলকাব্যের নিরিখে চণ্ডী ও মনসার আঞ্চলিক অবস্থান' নির্ধারণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে 'মনসা' ও 'চণ্ডীর' নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনাকে বিশ্বব্যাপকতার পরিপ্রেক্ষিতে উল্লেখ করা হয়েছে। 'মনসা'র বিশ্বব্যাপী রূপ অনুযায়ী তাকে সর্পকাল্টের অন্তর্গত করা যেতে পারে। এখন প্রশ্ন হল, সর্পপূজার অস্তিত্ব কিভাবে সর্বব্যাপী ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তিত হয়ে ভারতের জাতীয়, এবং জাতীয় ধারণার মধ্য দিয়ে বিবর্তন লাভ করে আঞ্চলিক দেবী মনসায় রূপায়িত হয়েছে? বাইবেলের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সর্পের সহিত 'অমঙ্গলের' প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে। বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই সর্প পূজিত হয় কখনো মঙ্গল, আবার কখনো অমঙ্গলের প্রতীক হিসেবে। অনুরূপভাবে, ভারতেও সর্পকাল্ট তার বৈশিষ্ট্যের পরিসর অতিক্রম করে আঞ্চলিক দেবী কাল্ট 'মনসা' এ রূপায়িত হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে 'রাজমার্তণ্ড' ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে বর্ণিত দেবী ভাগবত ও নাগদেবীও, পরবর্তীকালে আঞ্চলিকতার ক্ষেত্রে দেবী 'মনসা' বা 'পদ্মা' রূপে পূজিত হতে থাকে। এর ফলপ্রসূ, বঙ্গীয় পুরাণে

সর্পকাল্টের অন্তর্গত মনসা, ক্রমে শিবের ঔরসজাত হয়ে ঈশ্বরিক ক্ষমতা যুক্ত 'মানবী'তে পরিণত হয়েছে। পরবর্তীকালে লৌকিক ও ব্রাহ্মণ্যবাদের সংমিশ্রণে দেবী 'মনসা' ক্রমে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম নায়িকা চরিত্রে পরিণত হয়। আর সর্পের সাথে বেষ্টিত বিভিন্ন 'অমঙ্গলদায়ী' বিষয়গুলি ক্রমে লুপ্ত হয়ে 'মঙ্গলময়' ধারণার সাথে যুক্ত হয়। অনুরূপভাবে, চণ্ডী কাল্টও ব্যাবিলন, মিশর, সুমের, এশিয়ামাইনর, গ্রীস প্রভৃতি দেশের 'ফার্টিলিটি কাল্ট' বা 'উৎপাদনশীল' প্রতীকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, ভারতীয় 'মাতৃমূর্তি'তে রূপায়িত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্য এবং পুরাণ গ্রন্থগুলিতে 'শক্তি' কাল্টের সাথে 'মাতৃমূর্তি' বা 'মাতৃ' কাল্টের ধারণা সংযুক্ত হয়। সেখানে শক্তি মূলতঃ সৃষ্টি ও ধ্বংসের প্রতীক। শক্তি কাল্ট আবার 'অশ্বেতা' (কালী, দুর্গা, চণ্ডী, চামুণ্ডা) এবং 'শ্বেতা' (উমা, সতী, গৌরী, পার্বতী, অন্নপূর্ণা'), এই দুটি অংশে বিভক্ত। চণ্ডীর স্থান প্রধানত শক্তি কাল্টের অশ্বেতা অংশে। তবে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে, এই 'শক্তিস্বরূপা' দেবী ব্রাহ্মণ্য রাজনীতির প্রভাবে 'দেবীমাহাত্ম্যের' অন্তর্গত হয়ে ক্রমে 'মঙ্গলময়ী' দেবীতে পরিণত হয়।

গবেষণার দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শিবের অবস্থান' নির্ণয় করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'মনসা' ও 'চণ্ডীর' আভ্যন্তরীণ সূত্রধর প্রধাণত শিব। মঙ্গলকাব্যে তার অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি একাধারে মনসার পিতা ও চণ্ডীর স্বামী। তাকে এবং তার উপাসকদের কেন্দ্র করে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে বিভিন্ন বিবাদের সূচনা। এমনকি মনসা ও চণ্ডীর বিবাদের প্রধান কারণ তিনি। অতএব, তাকে বাদ দিয়ে 'মনসামঙ্গল' ও 'চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের' ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তার পূর্বে ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংস্কৃত ও পৌরাণিক সাহিত্যগুলিতে শিবের স্বরূপ নির্ণয় করা প্রয়োজন। শিব মূলতঃ আপাতবিরোধী একটি চরিত্র। হিন্দু ধর্মে শিবের চরিত্রের সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সংযুক্তি লক্ষ্য করা যায়। শিব কখনো 'যোগী, আবার কখনো সে 'কামরূপী'। অন্যদিকে সে 'পিতা' আবার 'পুত্র'ও। ভারতীয় হিন্দু সমাজে প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী শিবের রূপের ভিন্নতাও বর্তমান। শিবপুরাণ অনুযায়ী 'শিবের' ধারণার ব্যাপকতাকে অনুভব করা যায়। শিবপুরাণে শিব একাধারে

যেমন ‘শক্তি’, তেমনি ‘মায়া’, আবার ‘জ্ঞানের’ প্রতীক। তিনি সত্য, রজ, তম এর উর্দ্ধে। শিব প্রধানত এমন এক ধরনের ‘ডিসকোর্স’ বা ‘ব্যাপ্তি’, যার মধ্যে সমগ্র সৃষ্টি সম্পৃক্ত।

বাংলায় বাণিজ্যকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনার ক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য উপাদান হল মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলি। মঙ্গলকাব্যগুলি প্রাথমিকভাবে দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে রচিত হলে, পঞ্চদশ থেক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্যালোচনা করলে, মাহাত্ম্য প্রচার ব্যতিরেকে এর অন্যান্য বিষয়গুলিকে আলোকপাত করা সম্ভব হবে। মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্য একদিকে যেমন ‘মনসা’ ও ‘ চণ্ডী’র বিভিন্ন রূপের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনায় সহযোগিতা করে, অপরদিকে তেমনি শ্রেণীভিত্তিক এবং লিঙ্গভিত্তিক সামাজিক বিষয়গুলিকে উল্লেখ করে। অনুরূপভাবে কাব্যের বিভিন্ন অংশ থেকে মধ্যযুগে নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্যিক অবস্থানের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কাব্যের মুখ্য চরিত্র যেমন, চন্দ্রধর, ধনপতি এবং শ্রীমন্ত সওদাগররা সুদূর সিংহলে সপ্তডিঙা ও মধুকর ভাসিয়ে কিভাবে বাণিজ্য করতেন, কাব্যগুলির মাধ্যমে তার কল্পনাশ্রিত চিত্রকে অনুধাবন করা যায়। এছাড়া তাদের বাণিজ্যিক কৌশল এবং বাণিজ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তাও কাব্যে বর্ণিত। বাংলার তথা বাঙালির বাণিজ্যের প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে কেবলমাত্র সুপ্রাচীনকাল থেকে শুরু করে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সামুদ্রিক বাণিজ্যের উল্লেখ রয়েছে। এছাড়াও বাংলার বাণিজ্য আদৌ বাঙালির বাণিজ্য কিনা তাও পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে উল্লেখিত। অনিরুদ্ধ রায় এই প্রসঙ্গে মনে করেন যে, ‘ বাংলার সওদাগর’ এবং ‘ বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি’ সমুদ্রবাণিজ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলেও, বাংলার বণিকরা প্রকৃতপক্ষে বাঙালি বণিক কিনা সেই বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। বারবোসার বৃত্তান্ত অনুযায়ী বাংলার বণিকদের মধ্যে বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান। এরা ছিলেন মূলতঃ আরব, পারস্য এবং আবিসিনিয়া অঞ্চলের লোক। অতএব, বাংলার বণিকের বাস্তবতা প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে আলোচনা করা হয়েছে। তবে, বর্তমান অধ্যায়ে বাংলার সামুদ্রিক বাণিজ্যের

ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ছাড়াও, স্থান ও সময়ের ভিত্তিতে মনসামঙ্গল এবং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণগুলিতে নদী বাণিজ্যপথগুলিকে কিভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তার তুলনামূলক আলোচনা করা হবে। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যের সামুদ্রিক বাণিজ্যপথগুলির মধ্যে বিভিন্ন ‘দহ’ বা ‘হ্রদের’ প্রকৃত অবস্থানকে উল্লেখ করা হয়েছে। ‘দহ’গুলির অবস্থান আবার বাণিজ্যপথের ক্ষেত্রে লাভজনক না অলাভজনক তাও উক্ত অধ্যায়ে উল্লেখিত। উদাহরণ হিসাবে ‘কড়িদহ’, ‘শঙ্খদহের’ উল্লেখ করা যেতে পারে।

মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে কেন্দ্র করে তৎকালীন সময়ের বিভিন্ন সম্প্রদায়ভিত্তিক ও শ্রেণীভিত্তিক দ্বন্দ্বের অবতারণা করা আমার গবেষণার চতুর্থ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য। Richard Eaton এর বক্তব্য অনুযায়ী, তুর্কি আক্রমণের সময়কালে ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়াকে কাজে লাগিয়ে, সমাজে ধর্মান্তকরণ ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়েছিল। এই ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়াকে তিনি চারটি তত্ত্বে বিভক্ত করেছিলেন, যথাঃ ইমিগ্রেশন থিওরি বা অভিপ্রয়ান তত্ত্ব, সোর্ড থিসিস বা যুদ্ধজয়ের তত্ত্ব, রিলিজিয়াস পেট্রোনেজ থিওরি বা ধর্মীয় পৃষ্ঠপোষকতার তত্ত্ব এবং রিলিজিয়ান অব্ সোশ্যাল লিবারেশন থিসিস বা সামাজিক ও ধর্মীয় উদারীকরণ তত্ত্ব। এখন প্রশ্ন হল, মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কবিরা ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়াকে তাদের কাব্যে কিরূপে ব্যাখ্যা করেছেন? পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মনসামঙ্গলের প্রায় প্রতিটি সংস্করণে ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়ার প্রভাব প্রতিফলিত হয়। তবে, Richard Eaton যেভাবে ‘ইসলামীয়করণ’ প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করেন, মনসামঙ্গলের কবিরা কিন্তু এই প্রক্রিয়াকে সেরূপে ব্যাখ্যা করেননি। তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ইসলামীয়করণ প্রক্রিয়াকে বলপূর্বক ধর্মান্তকরণ প্রক্রিয়া হিসেবেই বর্ণনা করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের ‘মনসা-মঙ্গল’ এ ‘হাসন হুসেনের’ সাথে মনসার যুদ্ধযাত্রার বর্ণনা থেকে হিন্দু ও মুসলিমের দ্বন্দ্বের বিবরণ। তাদের কথোপকথনের কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় ‘হাসনের’ মনসাকে ‘হিন্দুর ভূত’ হিসেবে বর্ণনা করে। আবার মনসাও হাসনকে মসজিদ ভেঙে মন্দির নির্মানের কথা

বলেন। অর্থাৎ সম্প্রদায়ভিত্তিক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট। এছাড়াও মনসা ও হাসনের একে অপরের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া মূলতঃ হিন্দু ও মুসলিমের ধর্মভিত্তিক দ্বন্দ্বকেই ব্যাখ্যা করে। মনসা কর্তৃক হাসনের সম্পূর্ণ গ্রাম উজার করে দেওয়া, বিশেষত হাসনের ইসলাম ধর্ম প্রচারকদের প্রাণে মেরে ফেলা, প্রধানত ইসলাম ধর্মের প্রতি ব্রাহ্মণ্য শ্রেণীর ক্ষোভকে প্রতিফলিত করে। এর ফলপ্রসূ, তাদের ভয় ও ক্ষোভের প্রতিফলন হিসেবে বিভিন্ন মনসামঙ্গলের সংস্করণে 'হাসন-হুসেন' পর্বের উত্থান ঘটে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। প্রাথমিকভাবে আর্থিক অবস্থাকে কেন্দ্র করে উচ্চবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যবধান গড়ে ওঠে। এরপর বর্ণভিত্তিক রাজনীতি ক্রমে শ্রেণীভিত্তিক, এবং শ্রেণীভিত্তিক রাজনীতি ক্রমে জাতিভিত্তিক রাজনীতির সৃষ্টি করে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলের কবিরা ব্রাহ্মণ ব্যতিরেকে অন্যান্য সকল শ্রেণীর মন্দ দিকের বিবেচনা করেছেন।

'মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান'কে আলোচনা করতে উদ্যত হয়েছি। মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থা তথা যেকোন সময়কালীন সমাজে, 'লিঙ্গভিত্তিক অবস্থান'কে নির্ণয় করার ক্ষেত্রে আমরা সর্বদা 'নারীর সামাজিক অবদমন' নিয়ে আলোচনায় আগ্রহী হয়ে পড়ি। মঙ্গলকাব্যের নারীদের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা পূর্বের ও সদ্য মুক্তিপ্রাপ্ত গবেষণাগুলিতেও এই বিষয়ের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। জয়া সেনগুপ্তের রচনাতে যেমন বহুবিবাহভিত্তিক পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীর দুরাবস্থার এবং স্বল্প ক্ষেত্রে নারীর সচেতনতার চিত্র পাওয়া যায়, তেমনি মনসামঙ্গলের নিরিখে বিশ্লেষিত গবেষণাগুলিতেও নারীর সামাজিক অবহেলার রূপ পর্যালোচিত। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারী সামাজিকভাবে অবদমিত, তাতে কোন দ্বিমত নেই। এমনকি বর্তমান সমাজেও নারীর সামান্য ক্ষমতায়ণ সম্ভব হলেও, তারা কিন্তু সামাজিকভাবে অবহেলিত। তবে, বর্তমান আলোচনার প্রেক্ষাপট অনুযায়ী 'নারীর অবস্থান' নির্ণয়ের সাথে 'লিঙ্গভিত্তিক' বিভিন্ন বিষয়গুলিও আলোচনা করা হবে। কারণ লিঙ্গভিত্তিক আলোচনাকে 'নারীভিত্তিক' বিষয়ে মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 'নারী-পুরুষ' এবং

পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। এছাড়া ‘যৌনতাকে’ আলোচনার মূল অস্ত্র হিসেবে গ্রহণ করে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ কিভাবে তার অন্তর্জালের আবরণে ‘নারী’ ও ‘পুরুষ’ উভয়কে বেষ্ঠন করে ‘লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে’ কায়েম করেছে, তা আলোচনা করা প্রয়োজনীয়। প্রথমেই বলা যাক, সন্তান প্রজননের ক্ষেত্রে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধান কিভাবে কায়েম হয়েছে? সমাজে পুত্রসন্তান একান্তভাবে কাম্য। মঙ্গলকাব্যগুলিতে পুত্র ও কন্যা সন্তানের নিরিখে ‘লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানের’ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। পুত্রসন্তান কূল বা বংশ রক্ষা করে। আবার পরিবারকে বিভিন্ন সামাজিক বিপদ থেকেও রক্ষা করে। জরৎকারু মুনি বিবাহের পর মনসাকে পরিত্যাগ করতে উদ্যত হলে, মনসা তার কাছ থেকে ‘পুত্রসন্তানের’ কামনা করে। আবার শিবের ঔরসে চণ্ডীর পুত্রসন্তান পাওয়ায় ইচ্ছা মূলতঃ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক ব্যবধানকে চিহ্নিত করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর একান্ত ভরসা তার স্বামী ও পুত্র। আর কন্যাসন্তানের জন্ম হলে তাকে রক্ষা করবে কে? বিপ্রদাস পিপিলাইয়ের ‘মনসা-বিজয়’ এ জরৎকারু মনসাকে অষ্ট পুত্রের বরপ্রদান করে। কন্যাসন্তানের জন্য কোনরকম কামনা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংস্করণগুলোতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ সন্তানের জন্মকে কেন্দ্র করে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের পক্ষপাত, উল্লেখিত উদাহরণের মাধ্যমে অনুমান করা যায়। বিবাহের ক্ষেত্রেও পিতৃতান্ত্রিক রাজনীতি মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বিভিন্ন সংস্করণ থেকে পাওয়া যায়। বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর বয়স সীমা সাত থেকে এগারো বছরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু পাত্রের কোন বয়স সীমার উল্লেখ মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়না। রজঃস্বলার পর রমণীর শারীরিক পরিবর্তন ঘটে। এর সাথে তার বুদ্ধিও পরিপক্ক হয়। সে তার শরীর সম্বন্ধে অবগত হয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ নারীর শরীর সম্বন্ধীয় চেতনা জাগ্রত হওয়ার পূর্বেই তাকে বৈবাহিক কাঠামোয় বন্দী করতে আগ্রহী। বিবাহের ক্ষেত্রে অপর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পণপ্রথা। কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা কন্যাকে সুখী করার জন্য পাত্রপক্ষকে যৌতুক প্রদান করে। যৌতুকের পরিমাণ ঠিক কতোটা হয়ে পারে, তার

ব্যাখ্যা মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে পাওয়া যায়। পাত্রপক্ষের যৌতুক পাওয়ার আকাঙ্খাও মঙ্গলকাব্যগুলিতে বর্ণিত।

Keywords: মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, সামাজিক, অর্থনৈতিক, লিঙ্গভিত্তিক